একটি রাত ঃ তিনটি জীবন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হাসপাতালে সারাক্ষণ এত কাজ যে সোমনাথ অন্য কোনো দিকে মন দিতেই পারে না। এক সময় তার খেয়ার হয়, সারাদিনে সে একবারও হাসেনি। রোগীদের সঙ্গে সর্বক্ষণ শুধু জ্বালা-যন্ত্রণা আর দুঃখ-কষ্ট নিয়েই কথা হয়, তার মধ্যে হাসির খোরাক থাকে না। অথচ গোমড়ামুখো হয়ে কি মানুষ বাঁচতে পারে?

হাসপাতাল থেকে বেরুবার আগে সোমনাথ বুঝতেই পারেনি যে অনেক্ষণ বৃষ্টি নেমে গেছে। বৃষ্টি খুব জোর নয়, কিন্তু আকাশ কালো। বিকেলের পর আর সন্ধ্যা বোঝা যাবে না, এর মধ্যেই রাত্রি নেমে এসেছে। বিরাট বজ্র গর্জন হচ্ছে না, কিন্তু গ-র-র-গ-র শব্দ হচ্ছে মাঝে মাঝে। এরকম বৃষ্টি অনেক্ষণ চলে। সোমনাথ এখন ঘরে ফেরার জন্য ব্যস্ত।

হাসপাতালের বাইরে গোটা তিনেক সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে। সোমনাথ ছুটে গিয়ে উঠে পড়লো একটাতে। চালকটি গাড়ি বারান্দার নিচে বসেছিল, সেও চলে এলো। অন্য যাত্রী হলে এই বৃষ্টির মধ্যে সে হয়তো যেতে রাজি হতো না, কিন্তু ডাক্তার বাবুদের কথা আলাদা।

চালকটির বয়স একুশ-বাইশের বেশি না, লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরা একটা রোগা ছেলে। সে প্যাডেলে পা দেবার পর সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, কীরে, যেতে পারবি তো?

ছেলেটি বললো, হ্যাঁ স্যার। আমিও তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবো।

কোথায় যেতে হবে, তা আর বলার দরকার হলো না।

সোমনাথ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। মফঃস্বল শহরের রাস্তা একটু বৃষ্টিতেই ফাঁকা হয়ে যায়। সোমনাথ রাস্তা দেখছে না, বৃষ্টি দেখছে না। তার মেজাজ তেমন ভালো নেই।

হঠাৎ একটা জোর ঝাঁকুনিতে সোমনাথ প্রায় পড়েই যাচ্ছিল ছিটকে। কোনো রকমে সামলে নিল শেষ মুহূর্তে। তাকিয়ে দেখলো, রাস্তার পাশে একটা থেমে-থাকা ট্রাকের পেছনে সাইকেল রিকশাটা ধাক্কা মেরেছে।

রাস্তায় আলো কম, তা ঠিক। সাইকেল রিকশাতেও কোনো আলো থাকে না। সোমনাথদের ছেলেবেলায় গরুর গাড়ির তলাতেও একটা লন্টন ঝুলতো। এখন সেসব পাট উঠে গেছে। থেমে থাকা ট্রাকটার পেছনেও আলো নেই। এই সব জায়গায় সবাই কম আলোতে অভ্যস্ত। সব বুঝে-শুনেই তো রিকশা চালানো উচিত।
সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, কী হলো রে?
ধাক্কা দেবার পরও ছেলেটি চুপ করে বসে আছে। কোনো রকম সাড়াশব্দ করছে না।
সোমনাথ আবার জিজ্ঞেস করলো, কীরে, ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি?
ছেলেটি ভাঙা গলায় বললো, না স্যার। দেখতে পাইনি।
আবার সে প্যাডেলে চাপ দিল। চালাতে লাগলো আস্তে আস্তে। কোনো একটা জায়গায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টির ছাঁট লাগছে সোমনাথের গায়ে। রিকশার ওপরে ফুটো আছে কয়েকটা।
একটু বাদে ছেলেটি বললো, স্যার, একটা কথা বলবো? আমাকে আজ পঞ্চাশটা টাকা দেবেন?
সোমনাথ অন্যমস্তকভাবে বললো, কেন?
ছেলেটি বললো, স্যার, আজ সারাদিন কিছুই রোজগার হয়নি। বাড়ির জন্যে চাল কিনে নিয়ে যেতে হবে। আপনি দশ দিন ভাড়া দেবেন না, আপনাকে আমি নিয়ে যাবো।
এ কথা শুনে সোমনাথের রাগ হবার কথা। মন দিয়ে রিকশাটা পর্যন্ত চালায় না। অকারণে একটা ধাক্কা খাওয়ালো। রিকশাটা নোংরা, ফুটো। চড়ে কোনো আরাম নেই। তবু দিব্যি অ্যাডভ্যান্স চায়। বৃষ্টি বাদলা না থাকলে সোমনাথ রিকশা নিতেও চায় না। হেঁটেই নিজের জায়গায় ফেরে।
কিন্তু বাড়ির জন্য চাল কিনে নিয়ে যাবে, এ কথাটা শুনলে কেমন যেন লাগে। অন্য কিছু নয়, চাল। বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপাদান। মাত্র পঞ্চাশটা টাকা দিলে যদি কয়েকজন খেতে পায় তো পাক।
সোমনাথ আর একটা কথাও বললো না।
আজ তার কলকাতায় ফেরার খুব দরকার ছিল। কিন্তু কাল সেকেন্ড ইয়ার– থার্ড ইয়ারের জয়েন্ট ক্লাস আছে। সেই ক্লাসটা না নিলে গোলমাল হতে পারে। অথচ কলকাতা আজ খুব মন টানছে।
মস্ত বড় কম্পাউন্ডের সামনে গেট। ভেতরে বাড়িটা তিনতলা, সামনে ঢাকা গাড়িবারান্দা। সাইকেল রিকশাটা সেই বারান্দার নিচে থামলো।
নেমে পকেট থেকে পার্স বার করে সোমনাথ দেখলো, একটাকা দু'টাকার নোট দু'একখানা বাকি কয়েকটা একশো টাকার নোট। পঞ্চাশ টাকা দেওয়া যাচ্ছে না। একশো টাকার নোট দিলে পুরোটাই যাবে।
ওপর থেকে টাকাটা এনে দিতে হবে। সোমনাথ থাকে তিনতলায়। আবার নামা-ওঠা, সোমনাথের ইচ্ছে করলো না। সে বললো, এই, তুই ওপরে আয়, তোর টাকা দিচ্ছি।
ওপরে গিয়ে সোমনাথ সব ক'টা আলো জ্বাললো। আলমারির তালাটা খুলতে যাবে, এই সময় বাজ পড়লো বিকট শব্দে। বৃষ্টির তোড়ও বেড়ে গেল হঠাৎ।
টেবিলের ড্রয়ারে সব সময়ই কিছু টাকা-পয়সা থাকে। তার থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট নিয়ে বাইরে এসে সোমনাথ যেন ভূত দেখলো।
গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরা রিকশা চালকটি দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির ওপরের ধাপে। মাথার ওপরে একটা আলো জ্বলছে। এই প্রথম ছেলেটির মুখ ভালো করে দেখতে পেল সোমনাথ। তার চোখ দুটো কোটরে ঢোকা, অথচ তাতে জ্বলজ্বলে ভাব, মাথার চুল ভিজে কিন্তু কপালের চামড়া শুকনো। ছেলেটি একটু একটু দুলছে।
ভয় পাবার মতনই চেহারা।
সোমনাথ সোজা এগিয়ে এসে ছেলেটির কপালে হাত রাখলো। যেন ছ্যাঁকা লাগলো তার হাতে।
ছেলেটির অন্তত একশো চার জ্বর। সোমনাথ ওর চোখের তলা টেনে দেখলো। সেই সময় সে দু'বার শুকনোভাবে কাশলো।
ছেলেটি যে টিবিতে ভুগছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বেশ অ্যাডভান্সড স্টেজ।
সোমনাথ রীতিমতন রাগের সুরে বললো, তোর গায়ে এত জ্বর, তবু তুই রিকশা চালাচ্ছিস?
ছেলেটি চুপ করে রইলো।
–নাম কী তোর?

–আলতাফ মন্ডল।
–থাকিস কত দূরে?
–বলরামপুর স্যার, সাড়ে ছ' মাইল হবে এখান থেকে।
–রোজ জ্বর আসে?
–হ্যা স্যার।
–বাড়িতে আর কে আছে?
–ছোট তিনটি ভাই-বোন, মা, এক চাচা, বাবা নেই।
–আর কেউ রোজগার করে না?
–মা এক বাড়িতে রান্না করে।
সোমনাথ এতক্ষণ ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, তুই যদি এরকম জ্বর নিয়ে রিকশা চালাস, তাহলে তোর রোজগারে আর তোর বাড়ির লোকেদের বেশিদিন খেতে হবে না। তুই যদি বাঁচতে চাস, তোকে আমি কাল হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে পারি।
ছেলেটি মাথা নিচু করে থেকে জিজ্ঞেস করলো, টাকাটা দেবেন স্যার?
সোমনাথ বললো, তা নয় দেবো। কিন্তু তুই এই বৃষ্টি মাথায় করে সাড়ে ছ'মাইল রিকশা চালিয়ে যাবি?
–আমায় যেতেই হবে স্যার।
সোমনাথ পঞ্চাশ টাকার নোটিটি ওর হাতে দিয়ে দিল। ছেলেটি কপালের কাছে হাত এনে নমস্কার জানিয়ে পেছন ফিরতেই সোমনাথ আবার বললো, দাঁড়া।
সোমনাথের কপালটা কুঁচকে গেছে।
ডাক্তার হিসেবে এরকম দারুণ একটা অসুস্থ রোগীকে বৃষ্টির মধ্যে ছেড়ে দিতে তার বিবেক কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। এই অবস্থায় রিকশা চালানো মানে ছেলেটিকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়া। কিন্তু এ গরীব। ওর রোজগারে আরও চার-পাঁচটা প্রাণীর খিদে মেটে। সে সব চিন্তা করা ডাক্তারের দায়িত্ব নয়। ডাক্তারদের রোগের চিকিৎসা করতেই শেখানো হয়, সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের ভারতো তাদের ওপর কেউ দেয়নি।
সোমনাথ চিৎকার করে ডাকলো, রাম, রাম।
ছাদের ঘর থেকে তাদের কাজের ছেলেটি সাড়া দিল।
সে নিচে আসবার পর সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, ভাত রান্না করেছিস?
রাম বললো, অন্য সব রান্না হয়ে গেছে। ভাতটা এখনো চাপাইনি। আপনি যখন খাবেন, গরম গরম....
সোমনাথ বললো, বেশি করে ভাত চাপা। এই ছেলেটাকে খেতে দে। তোর থালা বাটিতে দিস না। শালপাতা জোগাড় কর।
তারপর বলাইয়ের দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বললো, এখন তোর বাড়ি ফেরা হবে না। রাম খাবার দেবে, খেয়ে-দেয়ে একতলায় শুয়ে যাস্। ওখানে মস্ত বড় বারান্দা ফাঁকা পড়ে আছে। কাল সকালে তোকে ভালো করে দেখতে হবে। রামের হাতে ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, রাত্তিরে খাবি।
আলতাফ সব শোনার পর বললো, আমি না গেলে যে বাড়ির লোক চিন্তা করবে। আমাকে ফিরে যেতেই হবে, স্যার।
সোমনাথ বললো, তুই মরতে চাস? তাহলে ফিরে যা। আর যদি বাঁচার ইচ্ছে থাকে, তাহলে আমি যা বললাম তাই শুনতে হবে। এখন যা ভালো বুঝিস, তাই কর।
সোমনাথ ঢুকে গেল নিজের ঘরে।
এই বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে আজ আর ক্লাবে যাওয়া হবে না। বাকি সন্ধ্যেটা তাকে ঘরেই বসে কাটাতে হবে একা-একা।
এই সন্ধ্যেগুলোই অসহ্য লাগে।
সপ্তাহে তিনটি দিন সোমনাথকে বাঁকুড়ায় কাটাতে হয়। সরকারের নতুন নীতি, কলকাতায় হাসপাতালের বড় বড় ডাক্তার-অধ্যাপক মফঃস্বলের মেডিক্যাল কলেজে অন্তত দু'বছর পড়াতে হবে।
সোমনাথ এই ট্রান্সফারে আপত্তি করেনি। সপ্তাহে তিনদিন এখানে ক্লাস নিলেই চলে যায়। বাকি দিনগুলো সে

কলকাতাতেই থাকে। ট্রেনে দুর্গাপুর পর্যন্ত এসে ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসে বাঁকুড়া শহরে। ভালো করে সে কখনো গ্রাম দেখেনি। পশ্চিমবাংলার গ্রাম চেনার তার শখও ছিল।

স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের এখানে আনেনি, তারা কলকাতাতেই থাকে। এখানে দু'জন ডাক্তার মিলে এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে। বিনায়ক অবশ্য স্ত্রীকে নিয়েই এসেছে, তার ছেলেটি ছোট, এখনো স্কুলে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। ওরা থাকে দোতলায়। তিনতলাতে দু'তিনটি ঘর খালি পড়ে আছে।

কলকাতায় আজ শান্তার গান আছে রবীন্দ্র সদনে। সোমনাথের উপস্থিত থাকার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আজ ফেরার কোনো উপায় নেই।

এই সময় প্রত্যেকদিন সোমনাথের স্নান করা অভ্যেস। স্নান করে সে পাজামা ও পাঞ্জাবি পরে নিল। এখনও বৃষ্টি পড়ে চলেছে। সোমনাথ চিরকালই দেরি করে ঘুমোয়, রাত সাড়ে বারোটা-একটার আগে বিছানায় যেতেই তার ইচ্ছে করে না। কলকাতায় থাকলে কীভাবে যেন হুশ করে সময় চলে যায়, এখানে সময় কাটতেই চায় না। এখন মাত্র আটটা বাজে।

সোমনাথ একটা গেলাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে জল মিশিয়ে নিল। কলকাতায় সে মাসে একবার-দু'বার কোনো পার্টিতে গিয়ে সামান্য মদ্য পান করে, তার নেশা নেই। কিন্তু এখানে বই পড়ার সময় একটু-একটু গেলাসে চুমুক দিতে তার ভালো লাগে। এখানে লোকেরা সন্ধ্যের পর এতখানি সময় কীভাবে কাটায়?

'মিলন-চক্র' নামে একটা ক্লাবে মাঝে মাঝে যায় সোমনাথ। কিন্তু সেখানেও আড্ডা ভেঙে যায় দশটার মধ্যে। রাম একটা হট বক্সে খাবার রেখে যায় তার জন্য। তার বাড়ি কাছেই, সে রাত্তিরে এখানে থাকে না। রামের কাছে খবর পাওয়া গেল, আলতাফকে ভাত দেওয়া হয়েছিল, সে কয়েক গেরাসের বেশি খেতে পারেনি। জ্বরে ধুঁকছে। রিকশা চালিয়ে ফেরার ক্ষমতাই তার নেই।

ও ছেলেটাকে হাসপাতালে ভর্তি করলে ওর বাড়ির লোকদের খাওয়াবে কে? তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, ও যদি মারা যায়, তখনই বা ওর বাড়ির লোকদের কী হবে? ডাক্তারের কি এই নিয়ে মাথাব্যথা করা উচিত?

রাম চলে গেছে অনেকক্ষণ। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। ইজি চেয়ারে বসে একখানা বই পড়ে যাচ্ছে সোমনাথ। সবেমাত্র এগারটা বেড়েছে।

ঘুমোবার আগে দরজা বন্ধ করে সোমনাথ। এখন দরজাটা খোলা। একটা শব্দ হতে সে পেছন ফিরে তাকালো। একটা নীল রঙের রাত-পোশাক পরা, সারা মুখে ক্রিম মাখা, চুলে চিরুনি চালাচ্ছে এক হাতে, দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বাসবী।

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, কী, বিনায়ক ফেরেনি?

বিনায়ক এখানে একটা চেম্বার খুলেছে। এর মধ্যে দারুণ জনপ্রিয়। বাড়ি ফিরতে রাত দশটা-সাড়ে দশটা হয়ে যায়।

বাসবী বললো, আজ ফিরবে না। পুরুলিয়ায় অপারেশন করতে গেছে। একজনের পেটে গুলী লেগেছে।

সোমনাথ একটু হাসলো। বিনায়ককে টাকার নেশায় পেয়ে বসেছে। এখন আর কোন চিন্তা করে না। কলকাতার চেয়ে এখানে তার উপার্জন অনেক বেশি। পেট থেকে গুলী বার করার মতন আর কোনো ডাক্তার বুঝি পুরুলিয়ায় নেই?

বাসবী বললো, আমার ভয়-ভয় করছে। নিচে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে। কে যেন কাশছে।

এক তলায় সার্ভে ডিপার্টমেন্টের অফিস। সন্ধ্যের পর কেউ থাকে না।

বাসবীর ভূতের ভয় আছে। বিনায়ক তা জানে। একটি তিন বছরের শিশু সমেত স্ত্রীকে রেখে সে সারা রাত বাড়ির বাইরে কাটাবে?

সোমনাথ বললো, ভয়ের কিছু নেই। ভূতদের কাশির অসুখ থাকে না। একতলায় আজ একটা ছেলে শুয়ে আছে।

বাসবী চমকে উঠে বললো, একতলায় কেউ শুয়ে আছে? কেন?

সোমনাথ বললো, সে গল্প তোমার শুনতে ভালো লাগবে না এখন। সে ছেলেটি অসুস্থ।

বাসবী বললো, যদি রাত্তিরে ওপরে উঠে আসে? তুমি বাড়িতে রোগী নিয়ে এসেছো কেন? বাড়িটাকেও হাসপাতাল বানাতে চাও?

সোমনাথ বললো, সে ওপরে আসবে না। তুমি দরজা দিয়ে শুয়ো। ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে?

বাসবী বললো হ্যাঁ। তুমি আমাকে একবারও বসতে বললে না? সোমনাথ ইতস্তত করে বললো, তুমি আমার এখানে... রাত হয়ে গেছে .... আমি একটু ড্রিংক করেছি।
খিলখিল করে হেসে উঠলো বাসবী।
রাত্রির নিস্তব্ধতায় যেন ছুরি বিধিয়ে দিতে লাগলো সেই হাসি। সে নিজেই চেয়ার টেনে বসে বললো, আমি একটু হুইস্কি খাবো।
একটা গেলাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে দিল সোমনাথ। তার কপালে চিন্তার রেখা। নির্জন বাড়িতে, তার ঘরে এক যুবতী এসেছে, অথচ সে খুশি হয়নি। বাসবীকে সে চলে যেতেও বলতে পারছে না।
পাতলা পোশাকে তার শরীরের রেখা স্পষ্ট। বুকের অনেকটা দেখা যায়। নিজের শোবার ঘরেই মেয়েরা সাধারণত এরকম পোশাকে থাকে।
হুইস্কির গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে বাসবী বললো, এইরকম বৃষ্টি রাতে আমার ঘুম আসে না, খুব গান শুনতে ইচ্ছে করে। তুমি একটা গান শোনাবে সোমনাথ?
সোমনাথ বললো, গান? আজকাল তো গান গাই না। ভুলেই গেছি সব।
বাসবী বললো, লন্ডনে গোল্ডার্স গ্রীনে দুর্গাপুজোর ফাংশানে তুমি অনেকগুলি গান গেয়েছিলে। একটা গান আমার দারুণ ভালো লেখেছিল। 'স্বপ্নে আমার মনে হলো, তুমি ঘা দিলে আমার দ্বারে....।' এই গানটা অন্য কারুকে গাইতে শুনলেও তোমার কথা মনে পড়ে। এই গানটা তোমার চেয়ে আর কেউ ভালো গাইতে পারে না।
সোমনাথ একটু হেসে মুখ নিচু করে বললো, কী যে বলো। আমি কি কখনো গান শিখেছি।
–ঐ গানটা একবার গাইবে, সোমনাথ?
–বাসবী, তোমার স্বামী আমার স্কুলের বন্ধু। আমি দুর্বল।
এত রাতে তুমি আমার এত কাছে বসেছো। আমার বুক টিপ টিপ করছে। এই অবস্থায় কি গান হয়?
–আমি কিন্তু তোমাকে একটু ভয় দেখাই না। আমি বুঝি আলাদা করে তোমার বন্ধু হতে পারি না? বিনায়ক মাঝে মাঝে এরকম রাত্তিরের দিকে সিল্কের লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে তোমার সঙ্গে আড্ডা দিতে আসে না? আমি মেয়ে, তাই আমার সে অধিকার নেই?
–থিয়োরিটিক্যালি তোমার কথাটাই ঠিক। পুরুষ আর মেয়েদের তবু আমি একচোখে দেখতে পারি না। সব মেয়েকেও শুধু মেয়ে বলে মনে করা যায় না। ধরো যদি এখানে মিসেস অনিমা হালদার আসতেন, তাহলে কি আমি ঘাবড়াতাম?
–তা হলেও তোমার বুক টিপ টিপ করতো। তুমি মিসেস হালদারকে খুব ভয় পাও, আমি দেখেছি।
–সে অন্য কারণে ভয় পাওয়া। উনি কথা বলতে আরম্ভ করলে থামতে চান না।
–তুমি কি চাও, আমি চলে যাই, সোমনাথ?
–আমি কী চাই? হ্যাঁ, তোমার এখন চলে যাওয়াই উচিত। অথচ আমার মন তীব্রভাবে বলছে, না তুমি থাকো, থাকো, থাকো।
বাসবী উঠে দাঁড়ালো। জানালার কাছে গিয়ে বৃষ্টি দেখলো। এরকম একটানা বৃষ্টি বহুদিন দেখা যায়নি।
মনে হয় যেন সারা পৃথিবী জুড়েই এখন বৃষ্টি পড়ছে।
গরম একেবারেই নেই, তবু যেন ঘামে চকচক করছে সোমনাথের কপাল। সে একটা সিগারেট ধরালো।
পাশেই সোমনাথের বিছানা। চেয়ারে বসার বদলে সে বিছানায় চলে যেতে পারে। বাসবীকে ডেকে নিতে পারে পাশে। এখন কেউ আসবে না। কেউ কিছু জানবে না। এই বৃষ্টির রাতটা একটা স্বপ্নের মতন কেটে যেতে পারে। তারপর সকালবেলা সব ভুলে গেলেই হলো।
পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছে বাসবীর। চওড়া পিঠ, সরু কোমর, ভারি নিতম্ব। দারুণ ওর শরীরের গড়ন। লন্ডনে প্রথমে তারই আলাপ বাসবীর সঙ্গে। বিনায়ক আর সোমনাথ দু'জনেই একসঙ্গে কাজ নিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ডে, সোমনাথের আগেই বিয়ে হয়ে গেছে, সে স্ত্রীকে নিয়ে যায়নি, প্রথম দিকে বিনায়ক তখনো বিয়ে করেনি। বাসবী তখন পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্রী, তাছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সে নাচে। বাঙালি সমাজে নাচিয়ে হিসেবেই তার বেশ নাম ছিল। তরুণ দুই ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় কিছুদিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছলো। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে বাসবীর নাচের সঙ্গে সোমনাথ গান গেয়েছে।

ওরা তিনজনে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেত। সোমনাথ যেদিন টের পেল বাসবী তার দিকেই বেশি ঝুঁকছে, সেদিনই সে জানিয়ে দিল যে, সে বিবাহিত। এ কথা গোপন করার কোনো মানে হয় না। তারপর থেকে তিনজনে একসঙ্গে কোথাও যাবার কথা থাকলে সোমনাথ শেষ মুহূর্তে ইচ্ছে করে যেত না। বিনায়ককেই সুযোগ দিত সে।
লন্ডনেই বিনায়কের সঙ্গে বাসবীর বিয়ে হয়ে গেল। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে গেল সোমনাথ। বাসবী তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রী, তার সঙ্গে ইয়ার্কি রসিকতা করা যায়। তার বেশি কিছু নয়। বিশ্বাসটাই তো বন্ধুত্বের প্রধান শর্ত।
সোমনাথ মাঝে মাঝে রাত্তিরে যেত বিনায়ক-বাসবীদের বেলসাইজ পার্কের অ্যাপাটমেন্টে। নতুন নতুন রান্নার এক্সপেরিমেন্ট এবং গান-বাজনায় কেটে যেত চমৎকার সময়।
ওদের বিয়ের মাত্র মাস ছয়েক পরে এক রাতে, বাসবী একটা মারাত্মক ইঙ্গিত দিয়েছিল। জানুয়ারি মাস, অসম্ভব ঠান্ডা পড়েছে, হাসপাতাল থেকে বাস ধরে ফেরার পথে সোমনাথ আর বিনায়কের হাত-পা, প্রায় জমে যাবার অবস্থা। ওরা কেউ তখনো গাড়ি কেনেনি। বাস থেকে নেমে, বিনায়কের বাড়ি পর্যন্ত যেতে বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। সেদিন বেশি মদ্যপান হয়ে গিয়েছিল। বিনায়ক সহ্য করতে পারেনি, এক সময় একেবারে অজ্ঞান। খেলনা কিছুই, ওকে ধরাধরি করে শুইয়ে দেয়া হল।
তারপর সোমনাথ আর বাসবী গল্প করলো অনেক রাত পর্যন্ত। দু'খানা ঘরের অ্যাপাটমেন্ট, তার মধ্যে একখানা ঘর সোমনাথ এসে প্রায়ই দখল করে। সেই রাতে সোমনাথ আলো নিভিয়ে শুতে যাবার একটু পরেই বাসবী এসে তার ঘরের আলো জ্বালালো।
বাসবীর ঘুম নেই চোখে, সে সোমনাথের কাছে থাকতে চায়। বাসবীর চোখ-মুখ দেখেই সোমনাথ বুঝতে পেরেছিল, বাসবীর নীতিবোধ অন্যরকম।
সোমনাথ তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে বলেছিল, তোমার ঘুম আসছে না। চলো, আমরা বসবার ঘরে গিয়ে গল্প করি। আমি ইচ্ছে করলে জেগে থাকতে পারি সারারাত।
বাসবীর থেকে অনেকখানি দূরত্ব রেখে বসেছিল সোমনাথ। সত্যি সত্যি নানারকম গল্প হলো।
বাসবীকে সে বুঝিয়ে দিয়েছিলো, বন্ধুর নববিবাহিতা স্ত্রী'র সঙ্গে শারীরিক ফুর্তি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বাসবী রাগ করেনি, মেনে নিয়েছিলো, সোমনাথের বন্ধুত্বই চেয়েছিলো তারপর থেকে।
কিন্তু সোমনাথের মধ্যে যে কি দারুণ একটা পরিবর্তন এসে গিয়েছিলো, তা বিনায়ক বা বাসবী কেউই ঘূর্ণাক্ষরে টের পায়নি। সেই রাত থেকে সোমনাথের বুকের মধ্যে জ্বলছে এক হিংস্র অতৃপ্তি। তার নীতিবোধ যা মানতে পারে না, তার যুক্তিহীন মন সেটাই তীব্রভাবে চায়। বাসবীকে যখন-তখন বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। তবু সোমনাথ খুব সাবধানে দূরত্ব রক্ষা করে, ওদের বাড়িতে আর রাতে থাকেনি একদিনও।
কলকাতায় ফিরে এসে দেখা-সাক্ষাৎ কমে গেল। দু'জনের বাড়ি দু'পাড়ায়, পেশা নিয়েও ব্যস্ত হয়ে পড়লো দুই ডাক্তার। তবু কোনো নেমন্তন্ন বাড়িতে বা ক্লাবে বাসবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই সোমনাথের বুক জ্বলে।
দাউ দাউ করে সেই অতৃপ্তি। বাসবী তাকে চেয়েছিলো, সোমনাথ সাহস পায়নি। এটা তার নীতিবোধ না কাপরুষতা। সেই রাতে বাসবীকে গ্রহণ করলে কি এমন ক্ষতি হতো?
এ সবই সোমনাথের মনে মনে। বাসবীর সঙ্গে সে হেসে হেসে কথা বলে, সব সময় খানিকটা দূরত্ব রাখে। ভদ্রতার সম্পর্ক যেমন রাখা উচিত, তা ঠিকই বজায় আছে। সোমনাথের স্ত্রী'র সঙ্গেও ভাব আছে বাসবীর।
শুধু এক এক সময় সোমনাথের খটকা লাগে। বাসবী হঠাৎ হঠাৎ কথা থামিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে চেয়ে থাকে সোমনাথের দিকে। তার ঠোঁটে তখন লেগে থাকে একটা অদ্ভুত ধরনের হাসি। বাসবী কি সোমনাথের ভেতরটা দেখতে পায়?
তারপর সরকারের উৎকট খেয়ালে সোমনাথ আর বিনায়ককে এক সঙ্গে বাঁকুড়ায় বদলি হতে হলো। দু'জনে একই বাড়ি ভাড়া নেবে, এটাই স্বাভাবিক। এখানেও সোমনাথ তার স্ত্রীকে আনতে পারেনি, বাস্তব অসুবিধে আছে। সারা সপ্তাহ সে এখানে থাকে না।
আবার বাসবীর এই সান্নিধ্য তার ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সর্বক্ষণ সেই আগুনের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে তাকে। এত বড় বাড়ি, কোনো এক সময় বাসবীকে নিভৃতে পাওয়া যেতেই পারে। বিনায়ক অনেক সময় থাকে না। তবু সোমনাথ একবারও বাসবীকে ডাকার ইঙ্গিত দেয়নি। সে জানে, বাসবীর চোখ-মুখ দেখেই

বুঝতে পারে, বাসবীকে ডাকলেই সে আসবে। সোমনাথ ডাকে না। প্রাণপণে তাকে ভদ্রতার সম্পর্ক রেখে যেতেই হবে।
আজ রাতে বাসবী নিজে থেকে এসেছে। বিনায়ক নেই, বৃষ্টির শব্দমাখা মোহময় রাত।
বাসবীর পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সোমনাথ আর লড়াই চালিয়ে যেতে পারলো না। তার ভেতরে যেন একটা বিস্ফোরণ হলো। চেয়ার ছেড়ে ওঠে গিয়ে সে বাসবীর কাঁধে হাত রাখলো।
বাসবী চমকালো না। সে যেন এর প্রতিক্ষাতেই ছিলো । মৃদু গলায় বললো, সেই গানটা শোনাবে না, সোমনাথ?
সোমনাথ গুণগুণ করে শুরু করলো, স্বপ্নে আমার মনে হলো, তুমি ঘা দিলে আমার দ্বারে হায় ...।
দু'লাইন গাইবার পর থেমে গিয়ে সোমনাথ বললো, সত্যি আমি দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখেছি, তুমি আমর দরজা ঠেলে আসবে একদিন।
বাসবী বললো, ওটা তোমার স্বপ্ন, আমার স্বপ্ন ...
সোমনাথ বললো, তুমি কি জানো, তোমাকে ভীষণ ভীষণ আদর করতে ইচ্ছা করে আমার।
বাসবী বললো, কি তুমি জানো তোমাকেই আমি প্রথম ভালো বেসেছি। সে কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না।
সোমনাথ বললো, কিন্তু আমাদের দু'জনের যে দুটো সংসার আছে। ছেলেমেয়ে আছে, এখন কি এই সংসার ভাঙ্গা যায়?
বাসবী বললো, সংসার ভাঙার কথা কে বলেছে? তুমি বড্ড মরালিষ্ট, সোমনাথ। আমরা গোপনে দু'জনে দু'জনকে ভালো বাসতে পারি না?
সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার কাছে আজ রাত্তিরে থাকবে?
বাসবী ফিরে দাঁড়ালো। তার ঠোঁট দু'টিতে ঝকঝক করছে বাসনা। তার সারা শরীর প্রস্তুত। তুচ্ছ নীতিবোধের জন্য সে জীবনের আনন্দ নষ্ট করতে চায় না। গোপনীয়তাকে সে পাপ মনে করে না। সোমনাথ বাসবীর কোমরে একটা হাত দিয়েছে, আর একটা হাত ওর বুকের সামনে উদ্যত।
এই সময় সে শুনলো কয়েকবার কাশির শব্দ।
একতলায় চট-ফট পেতে খোলা বারান্দায় শুয়ে আছে সেই ছেলেটা। এতো জোর কাশছে যে এই তিন তলাতেও শোনা যাচ্ছে। সোমনাথের অভিজ্ঞ কান সেই শব্দ শুনেই বুঝতে পারলো, ছেলেটা বাঁচবে না।
এখন কি এই সব কথা চিন্তা করার সময়? কতো গরীব লোকই তো মরছে।
সোমনাথের ক্ষণিক অন্যমনস্কতা বাসবীর নজর এড়ালো না। সে জিজ্ঞেস করলো, কী ভাবছো?
সোমনাথ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, অ্যা? ভাবছি, একবার শুরু করলে কি আর থামতে পারবো?
বাসবী তার বুকের কাছ থেকে সোমনাথের হাতটা সরিয়ে দিলো। মুচকি হেসে বললো, তোমার হাতটা ঠাণ্ডা। তুমি আসলে ভাবছো, তোমার বন্ধুর কথা। কিংবা তোমার স্ত্রী'র কথা। মিডল ক্লাস বাঙালী মরালিটি তুমি ছাড়তে পারবে না।
সোমনাথের থুতনিতে একটা টোকা মেরে মেরে সরে গেল বাসবী। সে রাগ করেনি। বরং হেসেই আবার বললো, থাক এভাবে হবে না। ভালোবাসার দরকার নেই, বন্ধুত্বই ভালো। আজ চব্বিশে জুলাই, ১৯৯২, আজকের দিনটা মনে থাকবে, আজ আমি আমার সব ভালোবাসা তোমাকে দিয়ে গেলাম। এরপর দেখো, আমরা শুধুই বন্ধু থাকবো।

সকাল বেলা সোমনাথ নিচে নেমে এসে দেখলো, আলতাফ তার আগেই চলে গেছে। সাইকেল রিকশাটাই নেই। বৃষ্টি থেমে গেছে শেষ রাতে, এখন চতুর্দিকে একটা পরিচ্ছন্ন ভাব।
বাড়ির সামনের কম্পাউন্ডে টাটকা বাতাসে নিশ্বাস নিতে নিতে সোমনাথ ভাবলো, ঐ আলতাফ নামের ছেলেটা যতবার সাইকেল রিকশার প্যাডেল ঘোরাবে ঠিক ততবারই তিল তিল করে ও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। ও যদি বাঁচতে না চায়, কে বাঁচাবে ওকে। কেউ না। এ দেশে কোনো রোগীকে কি জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা আছে?
এই সময় একট গাড়ি এসে থামলো গেটের সামনে। বিনায়ক ফিরে এসেছে।

বিনায়ককে দেখে অদ্ভুত আনন্দ হলো সোমনাথের।
কাল রাতে বাসবী চলে যাবার পর সে কিছুক্ষণ বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। সে কথা কেউ জানবে না। সে হেরে গেল বাসবীর কাছে। নিজের কাছেও।
কিন্তু কাল যদি সে বাসবীর সঙ্গে মিলিত হতো, তা হলে আজ সকালে বিনায়ককে দেখে কি সে স্বাভাবিক থাকতে পারতো? একটা চোর-চোর ভাব হতো না? বিনায়ক যে নিশ্চিন্ত বাইরে রাত কাটিয়ে এলো, তার কারণ সে তার বন্ধুকে বিশ্বাস করে।
সোমনাথের মনে এখন কোনো গ্লানি নেই।
সে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো, কিরে রাত্তিরে ফিরতে পারলি না?
বিনায়ক বললো, আর বলিস না। এক ব্যাটা জোতদার, জমি টমি নিয়ে কি সব গন্ডগোলে তার এক কাকা তার পেটেগুলি চালিয়ে দিয়েছে।
লোকটা আগে একবার কিডনির চিকিৎসা করিয়েছে আমার কাছে। গুলি খেয়ে সে কিছুতেই হাসপাতালে যাবে না, খালি আমার নাম ধরে চেঁচিয়ে বলছিল, ঐ ডাক্তার বাবু না এলে আমি বাঁচবো না। তাই ওর ছেলেরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল।
–বেঁচেছে?
–বেঁচে যাবে। গুলিটা বার করে দিয়েছে। জ্ঞান ফেরার পরই সে চ্যাঁচাতে লাগলো, সে তার কাকাকে তক্ষুণি খুন করতে যাবে। গ্রামের লোকের যা সব ব্যাপার।
–এ তো কেস হবে।
–হ্যাঁ পুলিশের এক দারোগা অপারেশনের সময় আমার পাশে বসে ছিল। তুই চা খেয়েছিস?
–না এখনো খাইনি।
–বাসবীর ঘুম ভেঙেছে?
–কী জানি দেখিনি।
–চল ওকে ডেকে তুলি। আমার সঙ্গে চা খেয়ে যা।
দুই বন্ধু সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো পাশাপাশি।
বাসবী জেগে উঠেছে এর মধ্যেই। ছোট বাচ্চা থাকলে সেই মা বেশিক্ষণ ঘুমাতে পারে না।
এখন বাসবী শাড়ি পরা, চুলে একটা আল্গা খোঁপা বাঁধা, এখন তার চেহারা বেশ স্বাভাবিক, ঘরোয়া। সুন্দর দেখাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু চোখে নেই মাদকতা। ঠোঁটের চকচকে ভাবটাও নেই।
সোমনাথকে দেখেই সে বকুনির সুরে বললো, কী যে করো তুমি। একটা রোগীকে নিচে শুইয়ে রেখেছিলে। সারা রাত সে এত কেশেছে যে সেই শব্দে আমি ঘুমুতেই পারিনি।
বিনায়ক চোখ দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার?
সোমনাথ বললো, ও একটা রিকশাওয়ালা। গায়ে খুব জ্বর ছিল, বৃষ্টির জন্য আর ফিরতে পারেনি।
বাসবী বললো, বাড়িতে তুমি রোগী নিয়ে আসবে, তার জন্য আমরা ঘুমোতে পারবো না।
সোমনাথ বললো সরি! আর কারুকে আনবো না।
বিনায়ক প্রসঙ্গটাকে গুরুত্ব না দিয়ে বললো, বাসবী চা চাপাও। তুমি ছৌ নাচের মুখোশ কিনতে চেয়েছিলে, তোমার জন্য অর্ডার দিয়ে এসেছি।
সোমনাথ বাসবীর দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, তার বুকের মধ্যে সেই বাসনার আগুনটা প্রায় নিভু-নিভু, এখন শুধু ধোঁয়া বেরুচ্ছে একটু একটু। বাসবী আর কোনো দিন তেমনভাবে আসবে না।
বিনায়ক বললো, আমাকে দশ হাজার টাকা ফি দিল, জানিস। গ্রামের এই সব জোতদার-ফোতদারদের কিন্তু অনেক টাকা।
বাসবী বললো, চলো এবারের ছুটিতে আমরা ভুটান যাই। বিনায়ক বললো, দাঁড়াও এখানে প্র্যাকটিস বেশ ভালো জমে উঠেছে। এক্ষুণি ছুটি নেওয়া যাবে না।
চা খেয়ে সোমনাথ ওপরে ওঠে এলো। সে এখনো কলকাতায় চেম্বার রেখেছে, এখানে প্র্যাকটিস করে না।

দুপুরে ভাত খায় না সোমনাথ। ব্রেকফাস্ট খেয়ে মেডিক্যাল কলেজে যায়। ক্লাস সেরে হাসপাতালে রাউন্ড দেয়। আজ সন্ধ্যা বেলা সে কলকাতায় ফিরে যাবে।
এক একটা ক্লাস শেষ হতেই সে একবার করে হাসপাতালের গেটের কাছে এসে উঁকি দিয়ে দেখে যেতে লাগলো। তৃতীয় বার এসে সে পেয়ে গেল আলতাফ মন্ডলকে।
সাইকেল রিকশার যাত্রীদের সিটের ওপর সে কাৎ হয়ে বসে আছে। আজ তার বেশ জ্বর। মুখ দেখলেই বোঝা যায়।
কাছে গিয়ে সোমনাথ বললো, এই, নেমে আয়। সকাল বেলা আমার কিছু না বলে চলে গেলি যে?
আলতাফ খুব ভয় পেয়ে বললো, আপনার ঘুম ভাঙাইনি, স্যার তাছাড়া বাড়ির লোক খুব চিন্তা করবে।
–নেমে আয়।
সোমনাথ ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বুকের এক্সরে তোলালো। রক্ত ও থুথু পরীক্ষার জন্য নিল। তারপর ওকে সামনে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলো, সাইকেল রিকশাটা কার, তোর নিজের?
আলতাফ বললো, না স্যার। মালিকের। রোজ দশ টাকা করে দিতে হয়।
–ভাড়া মিলুক না মিলুক, তবু দশ টাকা দিতেই হবে?
–হ্যাঁ স্যার। দশ টাকার ওপরে যা পাবো, সেটা আমার।
–সাধারণত কত থাকে তোর?
–পনেরো টাকা। এক একদিন একটু কমে যায়।
–তুই আর রিকশা চালাতে পারবি না। এমনকি আজ ঐ রিকশা চালিয়ে বাড়িতেও ফিরতে পারবি না। গাড়ি জমা দিয়ে দিতে হবে। বাড়িতে গিয়ে টানা এক মাস শুয়ে থাকবি।
–স্যার। কিন্তু রিকশা না চালালে আমার বাড়ির লোক খাবে কি?
–তোর বাড়ির লোক কি খাবে, তার আমি কি জানি?
তুই একটা রোগী, আমি তোর চিকিৎসা করবো। তোর বাড়ির লোক কি খাবে না খাবে, তা আমি চিন্তা করতে যাবো কেন? আমার কথা যদি না শুনিস, পুলিশে খবর দেবো। তুই তো টিবি রোগে মরবিই, আরও কত লোকের মধ্যে এই রোগ ছড়াবি। পুলিশ তোকে জেলে ভরে রাখবে।
সোমনাথ জানে, এটা নিতান্তই মিথ্যে ভয় দেখানো। টিবি রোগীকে নিয়ে পুলিশের মাথাব্যথা নেই। রাস্তার কত ভিখিরিরও তো এই রোগ আছে।
এখানকার হাসপাতালেও আলতাফকে ভর্তি করা যাবে না। এই হাসপাতালে টিবি রোগী রাখার ব্যবস্থা নেই। মেদিনীপুরের ডিগ্রী হাসপাতালে পাঠানো যেতে পারে, অথবা কাঁচড়াপাড়ায়। সেখানেও সিট আছে কি না জানতে হবে আগে। অচেনা, দূরের হাসপাতালে ছেলেটা যেতে চাইবে কি না, তাতেও সন্দেহ আছে।
সোমনাথ বললো, এক্সরেটা ঠিক উঠেছে কি না দেখে নিক, তারপর তোকে বাড়ী পাঠিয়ে দেবো। কিছু ওষুধপত্রও দিয়ে দিচ্ছি, নিয়মিত খাবি। একজন ছাত্রের সঙ্গে ব্যবস্থা করছি, সে তোকে ইঞ্জেকশন দিয়ে আসবে কয়েকদিন।
তারপর পকেট থেকে পার্সটা বার করে তিনটে একশো টাকার নোট বার করে বললো, এই তোর এক মাসের রোজগার। তা বলে ভাবিস না, আমি তোকে মাসে মাসে টাকা দেবো। আর কখনো এক পয়সাও দেবো না। আমি হয়তো বেশি দিন এখানে থাকবোও না। তোকে নিজের চেষ্টায় বাঁচতে হবে। নিচে নেমে এসে আর একজন রিকশা চালকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে দিল সোমনাথ। সে আলতাফের গাড়িটা জমা করে দেবে, তারপর তাকে পৌঁছে দেবে তার গ্রমের বাড়িতে। তার জন্য সে পয়সা পাবে অবশ্য।
শেষবারের মতন আলতাফকে সে শাসিয়ে বললো, এক মাস একেবারে চুপ করে শুয়ে থাকবি। বেশি হাঁটা চলা করবি না। কক্ষনো দৌড়েবি না। ভারী জিনিস তুলবি না। মনে থাকবে? যদি শুনতে পাই তুই রিকশা চালাচ্ছিস, তা হলে পুলিশে ধরিয়ে দেবো।
সোমনাথ লক্ষ করেনি, আলতাফকে ও অন্য রিকশা চালকটিকে যখন সে এই সব কথা বলছে, তখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এক মাঝ বয়েসী ভদ্রলোক। ধুতি-পাঞ্জাবি পড়া সৌম্য চেহারা, এর নাম বীরেশ্বর ঘোষ। এখানকার একটি স্কুলের হেড মাস্টার এবং যে ক্লাসে সোমনাথ মাঝে মাঝে আড্ডা দিতে যায় সেখানকার ভাইস

প্রেসিডেন্ট।
সোমনাথ মুখ ফেরাতেই বীরেশ্বর বললেন, নমস্কার। কী ব্যাপার বলুন তো। একটা রিকশাওয়ালাকে জামাই আদরে আর একটা রিকশায় চাপালেন, তারপর আবার তাকে ধমকালেন।
সোমনাথ একটু লজ্জা পেয়ে গেল। তার মেজাজটা ঠিক নেই, সে একটু বেশী জোরে জোরে কথা বলে থেমেছে। একটা নিবন্ত আগুন যে এখনো একটু একটু ধোঁয়াচ্ছে তার বুকের মধ্যে।
সে বললো মাস্টার মশাই, আমার সঙ্গে একটু হাঁটবেন? আমি বাড়ির দিকে যাবো। যেতে যেতে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো।
বীরেশ্বর বললেন, আমি তো হেঁটে হেঁটেই ঘুরি সব সময়। রিকশা চড়ি না। বলুন আপনার প্রথম প্রশ্ন?
সোমনাথ বললো, প্রশ্নগুলো আসলে সামাজিক প্রশ্ন। ধরুন, আমি একজন ডাক্তার। আমি যদি একজন লোককে দেখে বুঝতে পারি, সে একজন রোগী, তা হরে তার চিকিৎসা তো করতেই হবে।
–সেই রোগী আপনাকে কল না দিলেও আপনি চিকিৎসা করবেন?
–ধরুন, রাস্তার একটা লোককে দেখলাম। তখন তো কল দেবার প্রশ্ন নেই।
–আপনার ফি কে দেবে?
–ডাক্তারী পড়াবার সময় তো ফি নেবার কথা কিছু শেখায় না। অসুস্থ লোকদের সাহায্য করা বা বাঁচানো হচ্ছে ডাক্তারদের কর্তব্য। আমাদের ফি নিতে হয়, কারণ আমাদেরও তো সংসার চালাতে হবে। এটাই আমাদের জীবীকা।
–সে কি মশাই। আপনাদের মতন বড় বড় ডাক্তারদের ডেকে ডেকেও পাওয়া যায় না। ফি না নিয়ে চিকিৎসা করে আবার কোন ডাক্তার? এ রকম তো কখনো শুনিনি। আজকাল এক রোগীকে তিন-চার বার দেখলে প্রত্যেক বারই ডাক্তাররা সমান টাকা নেন। আগে দ্বিতীয় বার থেকে ফি অর্ধেক হয়ে যেতো।
–আহা, মাস্টারমশাই, কথাটা অন্য দিকে ঘোরাবেন না। আমি যা বলছি, তা নীতির প্রশ্ন। পরিবারের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও কি ডাক্তারকে করে দিতে হবে?
–ঠিক বুঝলুম না। আর একটু খোলসা করে বলুন।
–ধরুন, এই যে একজন সাইকেল রিকশা চালক। ওর সাংঘাতিক টিবি হয়েছে। আমি চিকিৎসা করে ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু এই রোগ নিয়েও রিকশা না চালালে ওর খাওয়া জুটবে না, ওর বাড়ির লোকও না খেয়ে মরবে। অথচ টিবি রোগী যদি সাইকেল রিকশা চালায় দিনের পর দিন, তা হলে যে তার চিকিৎসার কোনো মূল্য নেই, সেটা নিশ্চয়ই আপনি বোঝেন?
–সেই জন্যই ছেলেটাকে ধমকাচ্ছিলেন?
–ডাক্তারেরও তো বিবেক আছে। সে তার বিবেককে কী বোঝাবে?
–এত রোগী ঘাটাঘাটি করতে হয়। তারপরেও ডাক্তারের বিবেক টিকে থাকা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। রাস্তায় তো কত অসুস্থ ভিখিরি পরে থাকে, তাদের দিকে কি ডাক্তাররা ফিরে তাকায়?
–এই জন্যই তাকায় না, যে সেই ভিখিরির শুধু চিকিৎসা করলেই হবে না, তার খাওয়া থাকা সব কিছুর দায়িত্বই ডাক্তারকে নিতে হবে। এটা কি ডাক্তারের কাজ, না সমাজ কিংবা সরকারের কাজ?
–সবই তো জানি। আপনাকে একটু খোঁচাচ্ছিলাম, ডাক্তার সাহেব। ঐ আলতাফ নামের ছেলেটাকে আমি চিনি। এক সময় আমার মেয়েকে রোজ স্কুলে পৌঁছে দিত। ও নিজে ক্লাস সেভেন-এইট পর্যন্ত পড়েছে। ওর বাবা মারা গেল, সংসারে আর রোজগার করার কেউ নেই। খাটতে খাটতে ছেলেটার মুখে রক্ত উঠে গেলে।
–ও তো মরবেই। বীজাণু ছড়িয়ে ছড়িয়ে আরও অনেককে মারবে।
–আপনি নিজে থেকে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থ করলেন। এবার আমাদেরও কিছু একটা করা উচিত। ভেবে দেখি, কী করা যায়।
–যদিও ওকে অন্য একটা কাজ জুটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ক্লাস সেভেন-এইট পর্যন্ত পড়েছে, কী-ই-বা চাকরি পাবে? যাতে শারীরিক পরিশ্রম নেই।
–একটা ব্যবস্থা হতে পারে। আমাদের স্কুলে একটা দফতরির পোস্ট খালি হয়েছে। সেটা যদি ওকে দেওয়া যায়। বসে বসে ঘন্টা বাজাবে, ক্লাসে ক্লাসে অ্যাটেন্ডেস রেজিস্ট্রার পৌঁছে দেবে, মোটামুটি হালকা কাজ। সে কাজ ও

পেরে যাবে। সোমনাথ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।
বীরেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললো, এ তো খুব ভালো প্রস্তাব। আপনি হেড মাস্টার, আপনি অনায়াসে ওকে এই কাজটা দিতে পারেন।
বীরেশ্বর বললেন, স্কুল কমিটিকে বলতে হবে। মনে হয়, আটকাবে না।
–কত মাইনে?
–শ' পাঁচেকের মতন পাবে। দেখি চেষ্টা করে যদি আরও পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া যায়। আমাদের স্কুলের মাইনেপত্র ভালোই।
–মাস্টার মশাই, এ যে প্রায় অলৌকিক ব্যাপার। আমি ভেবেছিলাম, ও ছেলেটার কোনো আশা নেই। সপরিবারে মারা যাবে। আজই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি আজ সন্ধ্যেবেলা কলকাতা যাচ্ছি। তিন দিন পর ফিরবো। তখন আপনাকে এসব বলার কথা আমার হয়তো মনেই পড়তো না। ছেলেটার তাহলে একটা হিল্লে হয়ে গেল?
বীরেশ্বর একগাল হেসে বললেন, তা হলে কী প্রমাণ হলো?
ডাক্তার বাবুদেরও রোগীদের চাকরি-বাকরি নিয়ে ভাবতে হয়।
বেশ খুশি মনে শিষ দিতে দিতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো সোমনাথ।
তার হাতে আধ ঘন্টা সময় আছে। মুখ হাত ধুয়ে, হাসপাতালে পোশাক বদলে নিতে হবে। পাঁচটার সময় শেয়ারের ট্যাক্সি ছাড়ে দুর্গাপুরে যাবার জন্য। ঠিক কলকাতার ট্রেন ধরিয়ে দেয়।
ট্রেনে পড়ার জন্য একটা বই নিতে হয়। সোমনাথ বই বাছতে লাগলো।
রাম এসে বললো, দোতলার বউদিদি আপনাকে একবার দেখা করে যেতে বলেছেন।
সোমনাথ অবাক হয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলো।
বিনায়ক এ সময়ে বাড়ি থাকে না। বাচ্চাটা আয়ার সঙ্গে এই সময় বেড়াতে যায়। বাসবী একা। তবু সে ডেকে পাঠাবে কেন? কাল রাতের পর, আবার এই আহ্বান যেন মেলে না।
তবু যেতেই হবে।
কলকাতায় যাবার জন্য একেবারে তৈরি হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো সোমনাথ। আজ তার বুক টিপ টিপ করছে না, শুধু সূক্ষ্ম ব্যথার অনুভূতি রয়ে গেছে।
দরজায় বেল দিতে বাসবীই খুললো। কাজের লোক-টোক কেউ নেই।
বাসবী বললো, এসো–
কাল রাতের মতন মোহময়ী নয়, আজ সকালের মতন নিছক ঘরোয়াও নয়, বাসবী বেশ সেজে আছে। একটা নীল কাজ করা টাঙ্গাইল শাড়ি পরেছে, নীল পাথর বসানো কানের দুল দুটি সকালে ছিল না, গলায় একটা মটর-দানার মতন হার।
কিন্তু তার মুখে কোনো রহস্য নেই, একেবারে পরিষ্কার।
দরজাটা খোলাই রইলো, সোমনাথ ভেতরে এসে বসলো একটা
বেতের চেয়ারে।
বাসবী বললো, তুমি, তুমি তো আজ কলকাতায় যাচ্ছো। পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে। খিদে পাবে না?
এ আবার কী প্রশ্ন? খাওয়াটা আবার সমস্যা নাকি? দুর্গাপুর পৌঁছে কিছু খেয়ে নিলেই তো হয়। ট্রেনের কামরাতেও নানা রকম ফেরিওয়ালা আসে। সোমনাথ এখনো চলন্ত ট্রেনে বসে বাদাম ভাজা ছাড়িয়ে খেতে ভালবাসে।
বাসবী বললো, আজ একটা বড় ভেটকি মাছ দিয়ে গেল ওর এক পেসেন্ট।
অত বড় মাছ কে খাবে? তাই ফিস কেক বানিয়েছি। কেমন হয়েছে জানি না। তোমাকে খেতে হবে। তোমার ওপরেই প্রথম এক্সপেরিমেন্ট করবো।
লন্ডনে যখন প্রথম আলাপ হয়, তখন বাসবী একেবারেই রান্না জানতো না, ও থাকতো হস্টেলে। বিনায়ক আর সোমনাথের নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্ট ছিল, ওরা রান্না শিখে নিয়েছিল। বিনায়ক বেশ ভালোই রাঁধতো।

বিয়ের পরেও বাসবীর কখনো রান্নার দিকে ঝোঁক দেখা যায়নি। এখানে ওদের রান্নার লোক আছে। বাসবী রান্নাঘরে যাওয়াটা পছন্দ করে না।
সোমনাথ বললো, তুমি ফিস কেক তৈরি করেছো?
বাসবী হেসে ফেলে বললো, কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? একটা রান্নার বই দেখে শিখলাম।
সোমনাথ তবু অবিশ্বাসের সুরে বললো, ফিস কেক? কখনো খাইনি।
—খেয়ে দ্যাখো।
একটা কাট গ্লাসের সুদৃশ্য প্লেটে খানিকটা সাদা রঙের কেকের মতন জিনিসই নিয়ে এলো বাসবী। সঙ্গের কাঁটা-চামচ রুপোর। ওদের রুপোর ডিনার সেট আছে, সোমনাথ জানে, কোন দিন বার করে না।
বাসবী বললো, প্রথমে একটু খানি মুখে দিয়ে দ্যাখো। যদি ভালো না লাগে, খেও না। জোর করে খেতে হবে না।
সোমনাথ একটা বড় টুকরোই কেটে নিয়ে মুখে দিল। কোনো বিশ্রী গন্ধ নেই। মাছের গন্ধই নেই প্রায়, কিন্তু মাছের স্বাদ আছে, পুড়ে যায়নি, নুন বেশি হয়নি।
মুখ তুলে সোমনাথ বললো বাঃ। বেশ ভালো হয়েছে তো?
—সত্যি বলছো? আমি তোমার অনেস্ট ওপিনিয়ান চাইছি।
আমার মন রাখা কথা বলতে হবে না।
—সত্যি ভালো লাগছে। নতুন ধরনের জিনিস। এই দ্যাখো, সবটা খেয়ে নিচ্ছি। জানো তো, যে খাবারের টেস্ট আমর ভালোলাগে না, সেটা আমি কিছুতেই খেতে পারি না।
—শখ করে তৈরি করেছি। তাই ইচ্ছে হলো, তোমাকেই প্রথম পরিবেশন করবো।
—হঠাৎ রান্নার শখ হলো কেন, তোমার?
—একটা কিছু তো করতে হবে। পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্রী ছিলাম, সে পড়াশুনো কোনোই কাজে লাগলো না। এখন শুধুই হাউজ ওয়াইফ। আর হাউজ ওয়াইফই হয়ে যদি থাকতে হয়, তা হলে ভাল করে হওয়াই ভালো। রান্নাবান্না, সেলাই, ছেলে মানুষ করা, ঘর সাজানো—
—তুমি নতুন নতুন রান্না করলে ভালোই হবে। আমরা মুখের স্বাদ বদলাতে পারবো।
—সময় কাটাতে হবে তো। দুপুরে ঘুমোনোর বাজে অভ্যেস হয়ে গেছে। এরপর মোটা হয়ে না যাই।
—তোমার ফিগার খুব ভালো আছে ।
—বিকেলের পর থেকে আর সময় কাটে না। তোমার বন্ধু চেম্বার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তোমার বেশ মজা, এখন তিন দিন কলকাতায় কাটিয়ে আসবে।
—তোমরা ইচ্ছে করলে মাঝে মাঝে শনিবার বিকেলে কলকাতায় গিয়ে সোমবার সকালে ফিরে আসতে পারো।
—বিনায়ক কলকাতায় যেতেই চায় না। ওর তো থিয়েটার কিংবা সিনেমা দেখারও ঝোঁক নেই। আমার খুব থিয়েটার দেখতে ইচ্ছে করে। তুমি ঘড়ি দেখছো কেন? বসো, চা করছি।
সোমনাথ সত্যিই একবার চোরা-চোখে ঘড়ি দেখেছে। আর দেরি করলে পাঁচটার শেয়ারের ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না। এরপর অবশ্য সে একলাপুরো ভাড়ায় একটা ট্যাক্সি নিতে পারে। টাকা বেশি খরচ হবে, কিন্তু সে কথাটা বলা যায় না বাসবীকে।
সে উৎসাহ দেখিয়ে বললো, হ্যাঁ চা-তো খেতেই হবে। বাসবী জিজ্ঞেস করলো, আর একটু ফিস কেক নেবে?
—আপত্তিত নেই। কিন্তু এতটা খেয়ে ফেললে কি তোমাদের জন্য আর থাকবে কিছু?
—আরও অনেক আছে। মাছটা মস্ত বড় ছিল। ফ্রিজে রেখে তিন চারদিন খাওয়া যাবে। হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি কলকাতা থেকে ফেরার সময় বড় বাজার থেকে ভালো হিং কিনে আনতে পারবে আমার জন্য? এখানে ভালো হিং পাওয়া যায় না। একটা রান্নার রেসিপি দেখলাম, হিং দিয়ে চিকেন, সেটা একবার করে দেখতে চাই।
—ঠক আছে। নিয়ে আসবো। আর কিছু অর্ডার আছে? বাসবী আবার হাসতে লাগলো।
হাসি-ছাড়নো মুখে বলে মফঃস্বলের মানুষ এরকম হয়, তাই না? কেউ শহরে গেলে অমনি এটা-সেটা আনতে দেয়।
চা খাওয়াও শেষ হলো। আর দেরি করা যায় না। এরপর আর দুর্গাপুর থেকেও ট্রেন ধরা যাবে না।

বাসবী গল্প করার মেজাজে আছে। সোমনাথ তবু উঠে দাঁড়ালো। বাসবী আপত্তি করলো না । সে বললো হ্যাঁ, এবার তোমার যাওয়া দরকার। দরজার কাছে এসে সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, তুমি এত সাজগোজ করে আছে কেন? কোথাও বেরুবে বুঝি?
বাসবী বললো, না এখানে আর কোথায় যাওয়ার আছে?
বাড়িতেই থাকবো। এক একদিন নিজের জন্যই সাজতে ইচ্ছে করে। একটু সাজগোজ করলে, পারফিউম মাখলে মনটা ভালো থাকে।
বাড়ির বাইরে এসে সোমনাথ একটা রিকশার জন্য এদিক ওদিক তাকালো। একটাও দেখা যাচ্ছে না। খুব দরকারের সময় পাওয়া যায় না কিছুতেই। হেঁটেই যেতে হবে বাস স্ট্যান্ড।
দ্রুত হাঁটতে লাগলো সোমনাথ। হঠাৎ সে বুঝতে পারলো, তার মুখটা তেতো হয়ে আছে।
খাবারটার জন্য নয়, ফিস কেক বেশ সুস্বাদু ছিল। কিন্তু, কাল রাতে বাসবী তার নিজের শরীরটা দিতে চেয়েছিল, সোমনাথ নিতে পারেনি। আজ বাসবী তাকে মাছ খেতে দিল, সোমনাথ দিব্যি খেয়ে নিল। এর মধ্যে কি বাসবীর একটা সূক্ষ্ম বিদ্রুপ আছে? মনে মনে হাসছিল?
বাসবী আজ নিখুঁত ফর্মাল ব্যবহার করলো। যেন সে শুধুই তার বন্ধুর স্ত্রী, আর কিছু নয়। পুরোটাই কি ওর অভিনয়?
আজ চলে আসার আগে বাসবীকে অন্তত একটা চুমুও কি খেতে পারতো না সোমনাথ? একটা চুমু, কয়েক নিমেষের আনন্দ। তাতে সারা পৃথিবীর কারুর কোনো ক্ষতি হতো না।
চুমু খেতে চাইলে কি আপত্তি করতো বাসবী? ইচ্ছে প্রকাশ করারই তো সাহস হলো না সোমনাথের।
বাসবীর কাছে সে বার বার হেরে যাচ্ছে।

এরপর ন' বছর কেটে গেছে।
বাঁকুড়া থেকে আর ছ'মাসের মধ্যেই আবার ট্রান্সফার হয়ে ফিরে এসেছিল সোমনাথ। বিনায়করা দেড় বছর পর। বাঁকুড়ায় আর কোনদিনই যায়নি সোমনাথ, প্রয়োজন হয়নি, উপলক্ষ আসেনি।
কলকাতায় এখন সে বেশ ব্যস্ত ডাক্তার। নাম শুনলেই অনেকে চেনে। বিনায়ক আরও বেশি ব্যস্ত, আরও বেশি খ্যাতিমান। সল্টলেকে মস্ত বড় বাড়ি বানিয়েছে বিনায়ক, সোমনাথ গলফ, গ্রীনে ফ্ল্যাট কিনেছে। দু'জনে থাকে শহরের দুই প্রান্তে।
বাসবীর জন্য যে আগুন জ্বলতো সোমনাথের বুকে তা নিভে গেছে কবে, ধোঁয়া-টোয়াও আর বেরোয় না। ব্যথার বোধ নেই, সময়ই পায় না ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার।
বিনায়কের সঙ্গে সোমনাথের মাঝে মাঝে কোনো কোনো নার্সিং হোমে দেখা হয়ে যায়, অনেক সময় একই রোগীকে দু'জনেই দেখতে আসে, দুই বন্ধু কিছুক্ষণ গল্প হয়। বাসবীর সঙ্গে সোমনাথের দেখা হবার সুযোগ প্রায় নেই, সামাজিকভাবে মেলামেশা আর হয়ই না বলতে গেলে। বিনায়কদের সল্টলেকের বাড়ি তৈরি হবার পর বিরাট পার্টি দিয়েছিল ওরা। সেদিন বাসবী খুব ব্যস্ত ছিল। সোমনাথের সঙ্গে দুটো একটার বেশি কথা বলার সময়ই পায়নি। সোমনাথের চেয়ে বরং তার স্ত্রী শান্তার সঙ্গেই গল্প হয়েছে বেশি।
আর একদিন দেখা হয়েছিল ক্যালকাটা ক্লাবে। সেদিন মনে হয়েছিল যেন বাসবীর মুখখানা একটা সাদা পৃষ্ঠার মতন। সোমনাথের দিকে তাকাচ্ছে, অথচ তার দৃষ্টিতে কোনো ভাষা নেই। সোমনাথকে কি সে মন থেকে একেবারেই মুছে ফেলেছে। অথবা সে সোমনাথকে ঘৃণা করে? তাকে আর পুরুষ বলেই গ্রাহ্য করে না। সকলেই বলে বিনায়ক পরিশ্রম করছে বড় বেশি। টাকা উপার্জনের নেশায় সে উন্মত্ত। ছুটি নেয় না। কোথাও বেড়াতে যায় না। এর জন্য অবশ্য তাকে দু'টি ধাক্কা খেতে হলো।
একবার ছোটখাটো একটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেলে বিনায়কের। বন্ধুরা সবাই তাকে দেখতে গেল নার্সিং হোমে। সোমনাথও গিয়েছিল। সেদিন বাসবীর সঙ্গে তার দেখা হয়নি, বাসবী একটু আগে চলে গেছে। নার্সিং হোম থেকে। বিনায়কের অবশ্য গুরুতর কিছু হয়নি, মাসখানেক বাদেই সে আবার প্র্যাক্টিস শুরু করে ছিল আগের মতন।
তার কিছুদিন পরেই শোনা গেল, বাসবীর সঙ্গে বিনায়কের ডিভোর্স হয়ে গেছে।

খবরটা শুনেই সোমনাথের মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই বাসবীর একজন প্রেমিক জুটেছে। নিছক হাউজ ওয়াইফ সেজে থাকার মেয়ে সে নয়। তার নীতিবোধ আলাদা। গোপনে প্রেম করার ব্যাপারে তার কোনো দ্বিধা নেই। ডিভোর্সের পর বাসবী আলাদা একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে রইলো, একটা চাকরিও পেয়ে গেল লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে। ওদের ছেলেটি দার্জিলিং-এ।

কিন্তু বাসবীর প্রেমিকটি কে, সেটাই হলো অন্য ডাক্তারদের কৌতুহলের বিষয়। কিছুতেই তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সে একা থাকে, এখন সে একটা গাড়ি কিনেছে, ড্রাইভার রাখেনি, নিজেই চালায়, কিন্তু তার গাড়িতে অন্য কোনো পুরুষকেও দেখা যায় না কখনো। বিনায়কের বন্ধুদের বিশেষ কৌতূহল, বাসবীর প্রেমিকটি কোনো ডাক্তার কি-না। একজন ডাক্তার হয়ে অন্য ডাক্তারের বউকে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক এথিকাল নয়। অন্য পেশার কোনো লোক হলে অস্বাভাবিক কিছু নয়, বাসবী এখনো দেখতে ভারি সুন্দর রয়েছে।

কিন্তু কোথায় বাসবীর সেই প্রেমিক?

সোমনাথ আর বিনায়ক... এই দু'জনেরই বন্ধু বিশ্বদেব, সেও নামকরা হার্ট স্পেশালিস্ট, সে বিনায়কদের বাড়িতে প্রায়ই যায়। একদিন সেই বিশ্বদেব বেঙ্গল ক্লাবে লাঞ্চ খেতে খেতে অনেক ভেতরের কথা খুলে বললো।

বিশ্বদের বললো, দ্যাখ সোমনাথ, আমাদের মুস্কিল কি জানিস, একটা সময় যখন আমরা সার্থকতার মুখ দেখি, যখন বেশ নামডাক হয়, তখন একটা ট্র্যাজেডি ঘটে যায়। আমাদের ওপর, আমাদের সময়ের ওপর, আমাদের নিজেদেরই কোনো কন্ট্রোল থাকে না। আমরা বউ বাচ্চাদের দিকে তো তাকাতে ভুলে যাই বটেই, এমনকি নিজের দিকেও তাকাতে ভুলে যাই।

সোমনাথ বললো, সার্থকতা কাকে বলে? নিজের ব্যক্তিগত জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলা? যারা এটা বোঝে না, তারা নির্বোধ। মাঝে মাঝে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখা খুব দরকার। আমি কোন দিকে চলেছি, আমি শেষ পর্যন্ত কী চাই, সেটা ভাবতে হবে না?

–যারা ভাবে না, তারাই তো ট্রাজেডির শিকার হয়। দ্যাখ, বিনায়কদের যে বিয়েটা ভেঙে গেল, তার জন্য আমরা বাসবীকে দায়ী করেছি সবাই। আমরা পুরুষ মানুষ, তাই বিনায়কের পক্ষে। অনেকের ধারণা, বাসবী লুকিয়ে লুকিয়ে কারুর সঙ্গে প্রেম করেছে। মোটেই তা নয়। আসল কারণটা আমি জানি।

–সেটা কী?

–ওদের দু'জনের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কই ছিল না অনেক দিন।

–সে কি, কেন? বিনায়কের কোনো প্রবলেম আছে?

–প্রবলেমটা শারীরিক নয়, মানসিক। বিনায়ক কোনো দিনই বাসবীর মনটা বুঝতে পারেনি, বোঝার চেষ্টাও করেনি। বাসবী রোমান্টিক ধরনের মেয়ে। এ এক সময় নাচতো, গান বাজনা ভালোবাসে, নতুন কোনো থিয়েটার হলে দেখতে যাবেই। বিনায়কের এ ব্যাপারে কোন রস-কষ নেই। বউয়ের জন্য সে সময়ই দিতে পারে না। বউকে নিয়ে কোথাও যাবে, দু'দণ্ড বসে গল্প করবে, এমনকি ঝগড়াও করবে, তার সময় নেই? এরকম করলে কী চলে?

–অত টাকা নিয়ে বিনায়ক কী করবে? একটা তো মোটে ছেলে।

–বিনায়কের ধারণা, ও তো এত খাটছে বউয়ের জন্যই। সে অতবড় বাড়ি করে দিয়েছে, বাসবী যত ইচ্ছে গয়না গড়াতে পারে, মুঠো মুঠো টাকা খরচ করতে পরে.... কোনো কোনো মেয়ে এসবই ভালোবাসে, তাও সত্যি, কিন্তু বাসবী যে অন্য টাইপ, সেটাই বিনায়ক বুঝলো না। তার ফলটা কী হলো জানিস? বিনায়ক আমাকে নিজে বলেছে, রাত্তির বেলা বিছানায় বাসবীকে কাছে টানলে বাসবী সাড়া দেয় না। ওর শরীরটা ঠান্ডা হয়ে থাকে। স্বামীর সঙ্গে যদি একেবারেই মনের মিল না থাকে, তা হলে সেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঠিক মতন যৌন সম্পর্কও হতে পারে না। বিনায়ক বলেছে, প্রায় ন'-দশ বছর ধরে ওদের এই রকম চলছে। বাইরের লোকজনের সামনে স্বামী-স্ত্রীর ঠাট বজায় রাখে, অথচ ভেতরে ভেতরে কোনো সম্পর্কই নেই। এরকম একটা মিথ্যে ব্যাপার শুধু শুধু টিকিয়ে রাখার কী দরকার? সেই জন্যই তো বাসবী ডিভোর্স চাইতে বিনায়ক কোনো কনটেস্ট করেনি।

–তা হলে এর মধ্যে তৃতীয় পুরুষ কেউ নেই?

–তোকে খুব একটা গোপন কথা বলি, সোমনাথ। কারুকে জানাবি না। ওদের বাড়িতে তো আমি প্রায়ই যাই।

বাসবীর অবস্থাটা বুঝেছিলাম। বাসবীর ওপর আমার একটা দুর্বলতা জন্মে গিয়েছিল। আমি খানিকটা এগিয়েও ছিলাম। কিন্তু বাসবীই থামিয়ে দিল।
-চুমু-টুমু পর্যন্ত এগিয়েছিলি?
–ধ্যাৎ শালা। চুমু পর্যন্ত এগোলে আর বাকিটা হতে দেরি লাগে নাকি? শুধু এর হাত ধরেছি একদিন। বাসবী পরিষ্কার বলে দিল, বিশ্বদেব, তোমার সঙ্গে আমার ওসব কিছু হবে না। বিনায়কের কোনো বন্ধুর সঙ্গে প্রেম করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
সোমনাথের বুকের মধ্যে যেন কুলকুল করে একটা আনন্দের ঝর্ণা বয়ে যেতে লাগলো।
বাসবীর যে আর কোনো প্রেমিক নেই, এটা যেন তারাই একটা জয়। যদিও এরকম ভাবার কোনো মানেই হয় না। বাসবী তার কে? কেউ না। ন'বছর আগে এক রাতে সে বাসবীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে। তারপর আর কোনো যোগাযোগ নেই। দেখাও হয় না। বাসবী কি সোমনাথের কথা ভেবে ভেবে অন্য কারুর সঙ্গে প্রেম করেনি। তা হতেই পারে না। সোমনাথ নিজেইতো এর মধ্যে টুকটাক দু'তিনটে ছোট খাটো প্রেম করে নিয়েছে। এখন আর তার নীতিবোধ তত দৃঢ় নয়। একটি মেয়ের সঙ্গে গোপনে কিছু খেলাধুলো করাটাকে তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলেই মনে করে না।
বাসবী তার কেউ নয়, বাসবীর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখেনি সোমনাথ, তবু বাসবীর কোনো প্রেমিক আছে, একথা জানতে পারলে তার ঈর্ষা হতো।
সোমনাথ নিজের দাম্পত্য জীবনটাকে বেশ সামলে রেখেছে।
শান্তা গান-বাজনা করে, তার একটা নিজস্ব জগৎ আছে। সে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান করতে যায়, তার দুখানা ক্যাসেটও বেরিয়েছে। সোমনাথ নিজেও একসময় গাইতো, এখন আর চর্চা রাখতে পারে না বটে, কিন্তু সে নানান গানের অনুষ্ঠান শুনতে যায়। ক্লাসিকাল গান-বাজনার ফাংশন থাকলে সে চেম্বার বন্ধ রেখে দেয়, সারা রাত শোনে। এই সব সময়ে শান্তা তার সঙ্গে থাকে।
সোমনাথেরও প্র্যাকটিস বেশ জমজমাট, উপার্জন যথেষ্টও বেশি, কিন্তু বাড়াবাড়ি করে না সে। মাঝে মাঝেই ছুটি নেয়, ছুটি উপভোগ করতেও জানে। প্রতি বছর একবার পাহাড়ে একবার সমুদ্রের ধারে সে বেড়াতে যায় শান্তাকে নিয়ে।
এখন সে বুঝতে পারে, বাঁকুড়ার সেই রাতে সে যে বাসবীর স্পষ্ট আহবানেও সাড়া দেয়নি, সেটা তার কাপুরুষতা নয়, সেটা তার দূরদর্শিতা। একবার বাসবীকে বুকে জড়িয়ে ধরলে সে আর তাকে ছেড়ে দিতে পারতো না। তা হলে দুটো সংসার ভাংতে হতো।
শুধু প্রেমের জন্য অতখানি বিপর্যয় সামলাবার ক্ষমতা ছিল না সোমনাথের।
তবে, এ কথাও ঠিক, শান্তাকে কিংবা অন্য দু'একটি মেয়েকে সে যখন জড়িয়ে ধরে, থকন বুঝতে পারে, বাসবীর প্রতি তার যৌন টান ছিল অনেক বেশি তীব্র।
বাসবী আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে আছে, এবার একবার তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে কেমন হয়? চিন্তাটা মাথার মধ্যেই ঘোরে, কিন্তু সত্যি সত্যি যাওয়ার উদ্যোগ নিতে পারে না সোমনাথ।
একদিন সে সন্ধ্যেবেলা চেম্বারে বসে রোগী দেখছে, শেষ হয়ে এসেছে প্রায়, আটটার পর সে আর কিছুতেই চেম্বারে থাকে না। রোগীরা বসে আছে বাইরে, একজন বেরুলে সোমনাথের সেক্রেটারী নাম ধরে ডাকছে আর এক জনের।
একটি যুবক ঢুকলো, বেশ লম্বা ও স্বাস্থ্যবান, মাথায় ঘন চুল, ফর্সা রং, প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট পরা, তার শরীরে কোনো রোগ আছে বলে মনেই হয় না। যুবকটি এসেই টেবিলের তলায় সোমনাথের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।
সোমনাথ ত্রস্ত হয়ে বললো, আরে আরে এ কী।
যুবকটি বললো, আপনি ভালো আছেন স্যার?
সোমনাথ মৃদু ধমক দিয়ে বললো, হ্যাঁ, আমি ভালো আছি।
আপনি ওই চেয়ারে গিয়ে বসুন, তারপর বলুন, আপনার কী হয়েছে।
দু'একজন পুরনো রোগী এসে এরকম বাড়াবাড়ি করে। কিন্তু সোমনাথ এই লোকটিকে চিনতে পারলো না।

আগে কখনো দেখেছে বলেও মনে হয় না।
যুবকটি বললো, স্যার আমার নাম আলতাফ মন্ডল।
সোমনাথ বললো, হ্যাঁ, নামটা তো শুনলাম, এবার কাজের কথা বলুন। শুধু নাম শুনে তো রোগ বোঝা যাবে না।
যুবকটি বললো, স্যার, আমি বাঁকুড়ায় সাইকের রিকশা চালাতাম। আপনি একদিন রাত্রিবেলা...
সোমনাথ চমকে উঠলো তার মনে পড়ে গেল এবার সেই রোগা হাড় জিরজিরে ছেলেটাকেই সে দেখেছে, পড়েতো আর দেখেনি, সে এখন এরকম সুগঠিত, বলবান পুরুষ হয়ে গেছে? শুধু তাই নয়, তার পোশাক রুচি সম্মত, মুখখানি মধ্যবিত্ত, ভদ্রলোকদের মতন। সে যে একেবারে শ্রেণী পাল্টে ফেলেছে।
সোমনাথ ওর খবর একটু একটু জানতো।
প্রথম প্রথম বাকুড়া থেকে বীরেশ্বর মাস্টার মশাই চিঠি লিখতেন সোমনাথকে। তিনি ঐ ছেলেটির ব্যাপার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ছিলেন। নিজে নিজে পড়ে সে একেবারেই পাস করে গেল মাধ্যমিক।
সেখানেই থামলো না। তৈরি হতে লাগলো উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য। হেড মাস্টার মশাই নিজে ওকে পড়াতেন। উচ্চ মাধ্যমিক ফার্স্ট ডিভিশন পেয়ে গেল আলতাফ। স্কুলের পরিবেশে থেকে পড়াশুনায় তার ঝোঁক এসেছিল। এর কিছু পরেই বীরেশ্বর বাবু মারা যান।
তখন চাকরিটা রক্ষা করার ব্যাপারে কিছু গোলমাল হয়েছিল। অন্য দফতরিরাই শত্রুতা করেছিল তার সঙ্গে। চাকরি যখন যায় যায় অবস্থা, সেই সময় স্কুলের সেক্রেটারী এসে হস্তক্ষেপ করলেন। দফতরির বদলে কেরানির পদ দেওয়া হলো তাকে। লাইব্রেরিয়ানের সহকারী।
সেখানেই বই পড়ার আরও অনেক সুবিধে। আলতাফের তখন পড়াশুনোর নেশা ধরে গেছে। সে তার ছোট ভাই-বোনদেরও স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। তাদের বাড়িটা তখন আর রিকশাওয়ালার বাড়ি নয়, দফতরির বাড়ি নয়, কেরানির বাড়ি।
বিএ পরীক্ষাতেও ভালো রেজাল্ট করলো আলতাফ। অনার্সে হাই সেকেন্ড ক্লাস।
আলতাফ বললো, আমার আরও পড়ার ইচ্ছে ছিল স্যার। ঠিক করেছিলাম, ইকোনমিক্সে এমএ পরীক্ষা দেবো। কিন্তু এই সময় রেলের চাকুরির পরীক্ষার একটা বিজ্ঞাপন বেরুলো। অনেকেই বললো, ঐ পরীক্ষাটা দিতে। দিয়েছিলাম। ইন্টাভিউতে চান্সও পেয়ে গেলাম।
সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, তুমি এখন রেলে চাকুরি করো?
আলতাফ বললো, হ্যাঁ স্যার এখন আর বাঁকুড়ায় থাকি না। বহরমপুরে কোয়ার্টার পেয়েছি। আমার ভাই-বোন দুটোও কলেজে পড়ে।
সোমনাথ আলতাফের দিকে তাকিয়ে রইলো। এদেশে কত প্রাণ অকালে নষ্ট হয়ে যায়। কত ছেলে-মেয়ে একটু সুযোগ পেলে দাঁড়িয়ে যেতে পরে। কিন্তু সুযোগ পায় না, বঞ্চিত হয়, রোগে ভুগে হারিয়ে যায়। সোমনাথ তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে অন্তত একজনকে, দু'তিন মাসের মধ্যে মৃত্যু ছিল যায় অবধারিত, সে এখন সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ।
সোমনাথের সবচেয়ে ভালো লাগলো আলতাফের স্বাস্থ্য দেখে। সে একজন রীতিমত বলশালী যুবক, কে বলবে যে একসময় টিবি রোগে ভুগে এমন চেহারা করেছিল, যখন ওর বুকের সবকটা পাঁজরা গোনা যেত।
আলতাফ বললো, স্যার, সেই রাতটার কথা আমি কোনো দিন ভুলবো না, ২৪ শে জুলাই, ১৯৯২ সাল, খুব বৃষ্টি পড়ছিল, আমার খুব জ্বর, কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে, তবু রিকশা চালাতেই হয়, না হলে খেতে পাবো না, সেই সময় আপনার বদলে যদি আমি অন্য কোনো প্যাসেঞ্জার নিতাম, তা হলে হয়তো আমি আর বাঁচতাম না।
সোমনাথের শরীরে একটা শিহরন হলো। ঐ তারিখটা তার মনে থাকার কথা নয়। তবু মনে আছে। বাসবী ঐ তারিখটার কথা উচ্চারণ করেছিল। সেই রাতে বাসবী সব ভালোবাসা বিসর্জন দিয়েছিল, সোমনাথ প্রেমিক হতে পারেনি, হয়েছিল কাপুরুষ। বাসবীর শেষ কথাটাই সোমনাথের মাঝে মাঝে মনে পড়েছে, আলতাফের কথা সে ভুলেই গিয়েছিল।
আলতাফ আবার বললো, অনেকে বলে, আমার বেঁচে যাওয়াটা একটা মিরাকল। আপনার কাছে পঞ্চাশ টাকা চেয়েছিলাম, আপনি আমাকে ওপরে ডেকেছিলেন, বারান্দার আলোতে আপনি আমার মুখ দেখেই বুঝতে

পারলেন, আমার কতখানি অসুখ, আপনি বৃষ্টির মধ্যে আমায় বাড়ি ফিরতে দিলেন না, ওষুধ দিলেন, ভাত খেতে দিলেন, সেই জন্যই তো আমি বেঁচে গেলাম।
নিজের প্রশংসা শুনতে চায় না সোমনাথ। তার অস্বস্তি হয়। সে হাত তুলে থামিয়ে বললো, আমি আর এমন কী করেছি। ওরকম সবাই করে।
আলতাফ জোর দিয়ে বললো, না স্যার, সবাই করে না। আরও তো ডাক্তার বাবুরা রিকশায় চাপেন। কেউ আমাদের সঙ্গে কথাই বলতেন না। অন্য রিকশাওয়ালাদের অসুখ করে। আর কোনো ডাক্তার বাবু তো তাদের কারুকে সাহায্য করেন না। আপনি যুদি আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা না করতেন ...
সোমনাথ বললো, আমি শুধু তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু তোমাকে আসল সাহায্য করেছেন বীরেশ্বর মাস্টার মশাই। তিনি যদি তোমাকে ওই চাকরিটা জুটিয়ে না দিতেন...
আলতাফ বললো, মাস্টার মশাইয়ের একখানা ছবি আমি ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখেছি। কিন্তু ওনাকেও তো আমার চাকরির কথা আপনিই বলেছিলেন, না হলে কি উনি আমার কথা জানতে পারতেন?
মাস্টার মশাইও সব সময় বলতেন এই কথা।
সোমনাথ বললো, যাই হোক আলতাফ তুমি পুরোপুরি সুস্থ আছো, জীবনে দাঁড়িয়ে গেছ দেখে খুব ভালো লাগলো।
আলতাফ ওঠার ইঙ্গিতটা গ্রাহ্য করলো না।
সে বললো, অনেক আগেই আপনার সঙ্গে দেখা করা উচিত ছিল। এর আগে আপনাকে দু'খানা চিঠি লিখেছি, উত্তর পাইনি।
চিঠিপত্র সোমনাথ নিজে খোলে না, তার সেক্রেটারির ওপর ভার দেওয়া আছে। অপ্রয়োজনীয় চিঠি সে সোমনাথকে দেখায় না। বাংলায় লেখা ধানাই-পানাই করা চিঠি সে গ্রাহ্য করেনি বোঝা যাচ্ছে।
এড়িয়ে যাবার জন্য সোমনাথ বললো, হ্যাঁ, অনেক চিঠি আসে... আলতাফ বললো, আমার মা আমাকে প্রায়ই বলে, তুই ডাক্তার বাবুর সঙ্গে একবারও গিয়ে দেখা করলি না? তুই এমন নিমকহারাম। আসলে চিঠির উত্তর না পেয়ে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি কোথায় দেখা করবো।
প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে আলতাফ এবার একটা ছোট প্যাকেট বার করলো, মোড়কটা খোলার পর দেখো গেল, তারমধ্যে রয়েছে একটা ভেলভেটের বাকস। সেটা সম্ভ্রমে এগিয়ে দিল সোমনাথের দিকে।
সোমনাথ নিছক কৌতূহলে বাকসটা খুললো। বেশ চমকে গেল সে, রীতিমতন দামি একটা আংটি। অনেকখানি সোনার, তাতে তিনটি মুক্তো বসানো।
সোমনাথ তার দুই হাতের পাঞ্জা টেবিলের ওপর রেখে বললো, এটা নিয়ে আমি কি করবো? আমি কি আংটি পরি? এই দ্যাখো। আমি আংটি পরা একেবারেই পছন্দ করি নয়!
আলতাফ কাচুমাচু হয়ে বললো, স্যার, মা পাঠিয়েছেন। আপনি আংটি পরেন না, বউদিকে দেবেন।
–বউদির অনেক আংটি আছে।
–তা হলে এমনিই বাড়িতে রেখে দেবেন।
–বাড়িতে সোনার গয়না গড়িয়ে কারা রাখে? যারা মনে করে কখনো বিপদে পড়লে ঐ সোনা বিক্রি করবে। আমার সে রকম বিপদে পড়ার ঝুঁকি নেই। আমি যদি আজ হঠাৎ মরেও যাই, আমার স্ত্রীকে সোনা বিক্রি করে খেতে হবে না। এটা নিয়ে যাও। আমাকে কখনো কিছু দেবার চেষ্টা করবে না। নতুন চাকরিতে ঢুকেছো, এত দামি আংটি কিনে বাজে খরচ করার কোনো মানে হয়?
আলতাফ বললো, আমার চাকরিটা ভালো। শিগগিরই নিজের বাড়ি করার জন্য জমি কিনবো ভাবছি।
সোমনাথ কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো আলতাফের দিকে। উপরি, মানে ঘুষ? কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল সোমনাথ। একজন পেশেন্ট তার চাকরিতে ঘুষ নেবে কি নেবে না, সে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া বোধ হয় ডাক্তারের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না।
আলতাফ বললো, আমি জানতাম, আপনি এটা নেবেন না, মাকে বলেছিলাম সে কথা। আমি আর একটা জিনিষ ঠিক করেছি স্যার। অনেক গরিব লোকের টিবি হলেও চিকিৎসা হয় না। কাঁচাড়াপাড়া টিবি হাসপাতালে প্রত্যেক বছর আমি একজন করে রোগীর চিকিৎসার খরচ দেবো।

–বাঃ, এটা তো খুব ভালো কথা।
চেয়ার ছেড়ে উঠে এলো সোমনাথ। আলতাফের কাঁধে হাত রেখে বললো, এটা যা বললে, তাতে আমি সত্যিকারের খুশি হলাম। এমন করে ক'জন ভাবে? মাঝে মাঝে এসো, আলতাফ, তোমাকে দেখলে আমার ভালো লাগবে।
আলতাফ নিচু হয়ে আবার সোমনাথকে প্রমাণ করলো।
এর কয়েকদিন পরেই এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যা প্রায় অলৌকিক বলা যায়। অলৌকিক নয়, কাকতালীয়, শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হয়। তবু এমন ঘটনাও হঠাৎ ঘটে।
বাসবীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার ইচ্ছেটা সোমনাথের মনের মধ্যে গুঞ্জুরিত হচ্ছে বটে, কিন্তু যাওয়াই হয় না। ঠিকানা জোগাড় করেছে। গেলেই হয়, শুধু সময়ের অভাব নয়, আর একটা কিসের যেন বাধা রয়েছে।
তবু বাসবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।
বেলভিউ নার্সিং হোমে সোমনাথ একটা রাউন্ড দিতে গেছে রাত্তির বেলা, তার দু'জন পেসেন্ট আছে ওখানে, লিপটে তার কাঁধে হাত দিল বিশ্বদেব।
গম্ভীর ভাবে সে বললো, বাসবীকে দেখতে এসেছি?
সোমনাথ বিস্মিতভাবে বললো, বাসবী? সে এখানে ভর্তি আছে নাকি? কী হয়েছে তার?
বিশ্বদেব বললো, তুই জানিস না? স্ট্যাব ইনজুরি
এবারে প্রায় আঁতকে উঠে সোমনাথ বললো, স্ট্যাব ইনজুরি?
কে ছুরি মেরেছে বাসবীকে?
–তুই খবরের কাগজে পড়িসনি? কালকের কাগজেই তো বেরিয়েছে। রবিবার ছাড়া অন্যদিনের কাগজ ভালো করে পড়াই হয় না। শুধু হেডিংগুলোয় চোখ বুলোয় সোমনাথ। সে বাসবীর খবর কিছু দেখেনি।
ব্যাপারটা অত্যন্তই বিশ্রী এবং রোমহর্ষক।
মুর্শিদাবাদে বাসবীর এক দিদি থাকে, তার সঙ্গে সে দেখা করতে গিয়েছিল। ফিরছিল বিকেলের ট্রেনে। সেই ট্রেনে মাঝপথে একটা ছোট স্টেশনে থেমে রইলো। কোথায় নাকি তার কাটা গেছে, কখন আবার ট্রেন চলবে তার ঠিক নেই ট্রেন থেমে রইলে। কিছু কিছু যাত্রী নেমে চলে গেল, তারা অন্য জায়গা থেকে বাস ধরবে। বাসবী সে সব চেনে না। ট্রেন এখনো চলার আশা আছে, তাকে ট্রেনেই ফিরতে হবে।
কামরার মধ্যে অসহ্য গরম। আলো, পাখা নেই, ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছু যাত্রী প্ল্যাটফর্মে নেমে পায়চারি করছে। বাসবীও নেমে দাঁড়ালো এক সময়। স্টেশনটা অন্ধকার। বহুক্ষণ লোডশেডিং চলছে। বাসবীর অসহায় লাগছে, কিন্তু কিছু করাই উপায় নেই।
অন্য যাত্রীদের ভিড় ছাড়িয়ে সে এক সময় এগিয়ে গিয়েছিল প্ল্যাটফর্মের শেষ দিকটায়। হঠাৎ দেখলো, তাকে ঘিরে ধরেছে তিনজন লোক। একজন বিড়বিড় করে কি যেন বললো। আর একজন কাছে এসে তার গলার হারটা ধরে দিল এক টান। কিন্তু হারটা ছিঁড়ল না।
বাসবী তখন চেঁচিয়ে উঠতেই সেই তিন জন লোক বাসবীকে চেপে ধরে টানতে লাগলো বাইরে দিকে। একজনের হাতে ঝলসে উঠলো ছুরি, আর একজন একটা বোমা ফাটালো।
প্ল্যাটফর্মে কত লোক, কেউ এগিয়ে এলো না তাকে সাহায্য করতে। বোমার আওয়াজ শুনেই সবাই দৌড়ালো অন্য দিকে। বাসবী প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলেও তিন জনের সঙ্গে পারবে কেন? একজায়গায় রেলিং ভাঙ্গা, ওরা তাকে সেখান দিয়ে বার করতে চাইছে। মাঠের অন্ধকারে নিয়ে যেতে পারলে বাসবীকে আর জ্যন্ত পাওয়া যেত না।
সেই সময় একটা লোহার ডান্ডা নিয়ে ছুটে এলো একটি মাত্র লোক। গুন্ডারা আর একটা বোমা ছুঁড়লেও সে গ্রাহ্য করলো না। লোকটি যেমন গায়ে জোর, তেমনি সাহস। সে একা লড়ে গেল তিনজনের সঙ্গে। এই হুড়োহুড়ির মধ্যে বাসবীর গলার কাছে একবার ছুড়ি বসে গেল, গুন্ডারা সেই লোকটিকেও একবার ছুড়ি মেরেছিল, কিন্তু সে লোহার ডান্ডা দিয়ে তিনজনকেই কাৎ করে ফেললো এক সময়।
একজন ধরা পড়েছে, অন্য দু'জন পালিয়েছে। সেই উদ্ধারকারী আহত হলেও গুরুতর কিছু নয়। সে ভর্তি হয়েছে রেলের হাসপাতালে।

বাসবীর গলার কাছে ব্যান্ডেজ বাঁধা, সে চিৎ হয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছে। ব্যান্ডেজটার দিকে এক নজর তাকিয়ে সোমনাথ বুঝলো, বাসবীর ক্ষত নিয়ে তেমন চিন্তার কিছু নেই।
সোমনাথকে দেখে বাসবী হাসলো।
সোমনাথ টের পেল, তার বুকের মধ্যে, খুব গোপন কোনো জায়গায় সে বাসবীকে লুকিয়ে রেখেছিল এতদিন। সে যে ভেবেছিল, বাসবীকে একেবারে মুছে ফেলেছে, তা তো ঠিক নয়। বাসবীকে দেখেই মৃদু-টনটনে ব্যথা অনুভব করলো– কেন তা হলে?
বাসবীর একটা হাত ধরে সে বললো, তুমি ঐ সব লোকাল টেনে একলা ট্রাভেল করছিলে কেন?
বাসবী বললো, বাঃ ট্রেনে তো কত লোকই একলা যায়। আমার এখন একলা বেড়াতেই ভালো লাগে।
সোমনাথ বললো, দেশের অবস্থা তো জানো না। তোমার মতন একটি সুন্দরী মেয়েকে একলা দেখলেই গুন্ডারা স্পট করে। ওরা নিশ্চয়ই তোমার ওপর নজর রেখেছে অকেক্ষণ। তারপর যেই একটু নিরালায় পেয়েছে।
বিশ্বদেব বললো, ঠিকই বলেছিস, সোমনাথ। বাসবী, তোমার একলা আসা উচিত হয়নি। তুমি যে ফ্ল্যাটে একলা থাকো, সেখানে কোনো ভয় নেই তো?
বাসবী বললো, সেখানে কোনো ভয় নেই। কোনো অসুবিধা নেই।
–একলা কি সারা জীবন কাটাতে পারবে?
–তা জানি না। এখন দিব্যি আছি।
বিশ্বদেব বা সোমনাথ কেউই বলতে পারবে না, আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে থাকবো। ওদের সংসার আছে। সেই সংসার ওরা ভাঙ্গবে না।
একটুক্ষণ গল্প করার পর বিশ্বদেব বললো, আমি ঘুরে আসছি। আমার একজন পেসেন্ট-এর বেশ ক্রিটিক্যাল কন্ডিশান। পালাসনি, সোমনাথ আমরা একসঙ্গে ফিরবো।
এখন বাসবী আর সোমনাথ মুখোমুখি। একটি নার্স ঢুকেও আবার বেরিয়ে গেল। সোমনাথ কী কথা বলবে, খুঁজে পাচ্ছে না। দু'জনে দু'জনের হাত ধরে আছে, দুটি হাতই উষ্ণ।
বাসবী বললো, একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার কী জানো তো, সোমনাথ? যে লোকটা আমাকে বাঁচাতে এসেছিল, সে তো প্রথমে আমাকে ভালো করে দেখেইনি। এমনিই একটি মহিলা বিপদে পড়েছে দেখে সে ছুটে এসেছিল। আর কেউ আসেনি, ঐ লোকটি রেলে চাকরি করে, দারুণ সাহস, একেবারে শেষ কালে আমাকে ভাল করে দেখে সে বললো, দিদি, আমি তো আপনাকে চিনি। একসময় আপনি বাঁকুড়ায় ছিলেন না? আমিও বাঁকুড়ায় থাকতাম। আমার নাম আলতাফ মন্ডল। আমি অবশ্য ওকে চিনতে পারলাম না। কিন্তু ও আমাকে চেনে।
সোমনাথের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো। একেই কি মিরাকল বলে?
সে অস্ফুট স্বরে বললো, ২৪ শে জুলাই, ১৯৯২, তোমার মনে আছে সেই দিনটা?
বাসবী বললো, বাঃ মনের থাকবে না?
সোমনাথ মনে মনে বললো, ঐ একটা রাতে তিন জন মানুষের জীবন বদলে গেছে। একটু এদিক ওদিক হলেও এই তিনজন মানুষের জীবন অন্য রকম হয়ে যেতে পারতো।
বাসবী জিজ্ঞেস করলো, হঠৎ ঐ দিনটার কথা বললে কেন?
সোমনাথ আবার মনে মনে বললো, সেইদিনটা আর ফেরানো যায় না।
মুখে বললো, তোমার মনে আছে কি, সেই রাতে একতলার বারান্দায় শুয়ে একটা অসুস্থ লোক খুব কাশছিল? সেই শব্দে তুমি ঘুমোতে পারোনি? সেই লোকটিই আলতাফ মন্ডল। ওর জন্য তুমি ঘুমোতে পারোনি, তোমার কষ্ট হয়েছিল, তাই আলতাফ তোমার কাছে ঋণ শোধ করে গেল।